ষষ্ঠ অধ্যায়

জীবনরসিক মুকুন্দ এবং সমালোচক রামানন্দ

ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য ধারায় 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হলেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী। তাঁর লেখা 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি। আর্য ও আর্যেতর মানুষের আত্মিক মিলনের এক সামাজিক রূপান্তরের দলিলও বলা যেতে পারে। রোমান্টিক প্রণয়-চেতনার আকস্মিক মুক্ত দীপ্তিতে নয়, নিত্য প্রবহমান পরিবার-ধর্মের কথাতেও তিনি অধিক পারদর্শি। ক্ষেত্র গুপ্তের মতে— ''প্রেম-কথা চিত্রনে অগ্রসর হয়েও তিনি দ্বিধামুক্ত নন। মুক্তপ্রেমের লীলা-বিলাস-বিচিত্রতা-বর্ণাঢ্যতা অপেক্ষা দাম্পত্য প্রণয়ের প্রাত্যহিক স্তিমিত আবেগের বর্ণনায় কবির আগ্রহ অনেক বেশি।''[১] কাহিনির প্রয়োজনে যুদ্ধের প্রসঙ্গ আসলেও স্বাভাবিকভাবে অনুমান করা যায় সেখানেও তাঁর মন জাগেনি। আসলে তিনি ছিলেন জীবনরসিক শিল্পী। জীবন ঘটনার প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যেও তিনি কৌতুকহাস্যের অকস্মাৎ বিচ্ছুরণে অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা বা চরিত্রের গভীরে নতুন আলোকপাতেই তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় রেখে গেছেন।

অন্যদিকে মধ্যযুগের অন্তিমপর্বে অবস্থান করে যে কয়েকজন কবি মঙ্গলকাব্যের ধারাকে কোনোভাবে টিকিয়ে রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন রামানন্দ যতি বা রামানন্দ গোস্বামী। তাঁর কাব্যের নাম 'চণ্ডীর গীত'। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলের প্রায় চোদ্দ বছর পর তিনি তাঁর কাব্যটি রচনা করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর অবক্ষয়ী যুগে জীবনরসকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র মুকুন্দের কাব্যের সমালোচনার উদ্দেশ্যেই তিনি কাব্য রচনায় ব্রতী হন। তাই 'চণ্ডীমঙ্গল' ধারার এই দুজন কবির রচনার বিষয়বস্তু এক হলেও তাঁরা সৃষ্টির দুই মেরুতে অবস্থান করেছেন। প্রথম জনের কাব্যে ধরা দিয়েছে জীবনরস এবং অপর জনের কাব্যে উঠে এসেছে সমালোচনা।

জীবনরসিক মুকুন্দ : সাহিত্য কোন স্বয়ম্ভু ঘটনা নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য একসময় ইতিহাসের রেখাচিত্র হয়ে ওঠে। গবেষণার সন্ধানী আলো তৎকালীন সমাজের ধর্মীয়, স্থানীয় সর্বোপরি মানুষের মানসিক বিবর্তনের সঠিক চিত্র তুলে ধরে। যুগে যুগে,

কালে কালে মানব যাত্রার স্মারক হয়ে উঠতে পারে সাহিত্য। আবার কোন কোন সাহিত্য তা নিজের যুগ সীমানা অতিক্রম করে নিত্যকালের সঙ্গী হয়ে যায়। সেরকমই রচনা হল কবিকঙ্কণ মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যটি।

গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ অংশে কবি তাঁর বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে তৎকালীন সমাজ জীবনের এক জীবন্ত চিত্রকে অঙ্কন করেছেন। মূল কাহিনি চণ্ডীমঙ্গলের পরিচিত কাহিনি সীমানা আর বিন্যাসকে অতিক্রম না করে আত্মজীবনী অংশে মুকুন্দ বাস্তবতা, মানবধর্ম ও জীবনরসের মিশ্রণে অনবদ্য করে তুলেছেন। আত্মজীবনে উপলব্ধ জীবনরস তাঁর কাব্যের সর্বত্র এক নতুন লাবণ্যছটা নিয়ে প্রবাহিত। মুকুন্দের আত্মজীবনী ও গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ থেকে বোঝা যায় তৎকালীন সময়ের বিবরণ। চণ্ডীমঙ্গলের কাব্য কাহিনির দুটি গল্প। একটি কালকেতু উপাখ্যান। অন্যটি ধনপতি শ্রীমন্ত সওদাগরের গল্প। প্রথম পর্ব আখেটিক খণ্ডের দুটি ভাগ। একটি দেবখণ্ড, অন্যটি নরখণ্ড। এই দেবখণ্ডের অকৃত্রিম দেবতাটি হলেন শিব এবং গৌরী, তাদের গৃহস্থলী মুকুন্দের অভিজ্ঞতার আলোকে আলোকিত। গল্প-কাঠামোর সমস্ত প্রাচীনতা ভেদ করে মুকুন্দের জীবনবোধ তাঁদের বাঙালি ঘরের আঙ্গিনায় নিয়ে এসেছে। দৈবীদূরত্ব নয় বরং মেনকার ঘরজামাই পোষার বিরক্তিতে এবং গৌরীর অভিমানাহত জবাবে মুকুন্দের জীবন অভিজ্ঞতা পরতে পরতে উপলব্ধি করা যায়। আবার ব্যাধ কালকেতুর মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব আনার চেষ্টায় তাকে কৃত্রিম করেননি। কালকেতুর স্ব-কৃত পরিশ্রমে গুজরাট নগর নির্মাণ বেশ কৌতূহলপ্রদ। মুসলমানদের বর্ণনায় কবি প্রদত্ত তথ্যও প্রায় নির্ভুল। মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি কখনো কখনো বিরূপ মন্তব্য কবিকে পক্ষপাতিত্ব দোষ থেকে মুক্ত করেছে। সমগ্র কাব্য জুড়ে এক চিরন্তন মানবধর্ম ফল্গু স্রোতের মত প্রবাহিত হয়েছে। বাস্তবতাবোধ, চরিত্র-চিত্রণে বিশদ খুঁটিনাটি ও মনস্তত্ত্ব আরোপ এবং প্রবাহিত সর্বধর্ম সমন্বয়ী মানবরস মুকুন্দের রচনাটিকে আধুনিক লক্ষণের কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছে।

বর্ধমানে রত্না নদীর তীরে দামুন্যা (দামিন্যা) গ্রামে কবির পরিবারের কয়েক পুরুষের বসবাস ছিল। (বর্তমানেও দামিন্যায় কবির বংশধরেরা বসবাস করছেন।) মূলতঃ তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ কৃষিজীবি, তাঁদের তালুকদার ছিলেন গোপীনাথ নন্দী। পরে রাজনৈতিক সংকটের আবর্তে সামাজিক জটিলতা দেখা দেয়। ডিহিদার মামুদ শরীফের অত্যাচার ও শাসন দেশের লোকের কাছে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় সাধারণ গৃহস্থ মানুষ, মধ্যবিত্ত ও

ধনীরাও দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ল। কৃষিজীবি কবির কাছে পিতৃপুরুষের ভিটা দামিন্যা তখন দুঃস্বপ্ন। কৃষিই যার জীবিকা তাঁর পক্ষে এমনভাবে থাকা সম্ভব নয়। কর্মচারীরা খেয়াল খুশি মতো কর আদায় করতে লাগল। পনেরো কাঠা জমিকে এক বিঘা করা হল এবং অনাবাদী জমিকে সুফলা ঘোষণা করা হল—

''সহর সেলিমাবাজ তাহাতে সজ্জনরাজ
নিবসে নেউগি গোপীনাথ
তাহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ চষি
মিরাস পুরুষ ছয় সাত।
ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদে লোলভৃঙ্গ
গৌড় বঙ্গ উৎপক মহীপ
অধর্মী রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে
খিলাত পাইল মামুদ সরিপ।
উজির হইল রায়জাদা বেপারি বৈশ্যের খদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হইল ঐরি
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাঞি মানে প্রজার গোহারি।
সরকার হইল কাল খিল ভূমি লিখে লাল
বিনি উবগারে খায় ধুতি
পোতদার হইল যম টাকা আড়াই আনি কম
পাই লভ্য খায় প্রতিদিন।''[২]

কবির মতে—''ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হইল অরি।'' এমন অবস্থায় কবি বাধ্য হলেন গৃহত্যাগ করতে। স্ত্রী, শিশুপুত্র, কনিষ্ঠ ভাইকে নিয়ে মেদিনীপুরের হিন্দু প্রধান অঞ্চলের দিকে যাত্রা করলেন। যাত্রার প্রারম্ভেই দস্যু রূপ রায় তাদের অর্থ কেড়ে নিল। সেখানে যদু কুণ্ড তেলি রক্ষা করল। এরপর মুড়াই নদী পার হয়ে ভেউঠিয়া গ্রাম পেরিয়ে, দারুকেশ্বর-নারায়ণ-পরাশর-আমোদর পেড়িয়ে কোঁচড়িয়া গ্রামে এলেন। সেখানে গ্রামের এক পুকুর পাড়ে আশ্রয় নিলেন কবি ও কবির পরিবার। শালুক ডাঁটা চিবিয়ে, জলপান করে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবৃত্ত

করলেন কবি। দুশ্চিন্তায়, ক্ষুধায় ক্লান্তিতে গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়লেন স্বপ্নে, দেখলেন মা চণ্ডীকে, চণ্ডী তাঁর মহিমা বিষয়ক কাব্য লিখতে আদেশ দিলেন। কবির বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতা তাঁর লেখনীতে এক আশ্চর্য জীবন-রস সঞ্চারিত করেছে—যা মধ্যযুগের কাব্যে বিরল।

এভাবেই কবিকঙ্কণের আলোচনায় সূক্ষ্মভাবে কিংবা অনিবার্যভাবেই এসে পড়েছে তাঁর বাস্তবতাবোধের কথা। সাহিত্য যে সমাজ-বিশ্লেষণী সূত্র নিয়ে হাজির হতে পারে কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল' তার উজ্জ্বলতম নিদর্শন। এখানকার সমাজ মানুষের মনের অন্তর্লীন কোনো সমাজ-আলোখ্য নয়, তৎকালীন রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রশাসন ব্যবস্থা, উৎপাদন ও বন্টন, কৃষি-ব্যবসা-বাণিজ্য, কুটীর শিল্প, কর নির্ধারণ, জাতি বন-বিভাজন সব কিছুকেই বোঝায়। ভূমি-সীমার পরিমাপে রাজা বড় এবং তার তুলনায় ছোট ছোট ভূস্বামী বা জমিদারদের আর্থিক ক্ষমতা ও প্রশাসনিক নানা ছবি মুকুন্দ রচনা করেছেন। কাব্য মধ্যে রয়েছে কালকেতুকে বড় রাজা ও তাঁর অধীনস্থ ছোট ছোট রাজাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলতে হতো। রাজকার্য সামাল দিতে রাজা ছাড়াও ছিলেন পাত্র, মহাপাত্র, পুরোহিত—

''পাইআ বীরের পান বৈসে জত কুলস্থান
বীরের নগরে বিপ্রগণ
শাস্ত্র বিচার করে আশিষ করিআ বীরে
নিত্য পায় ভূষণ চন্দন।''[৩]

পুরোহিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁর প্রদত্ত শাস্ত্রবিধান রাজকার্যের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে রাজকার্য সম্পাদিত হত। প্রয়োজনে এরা যুদ্ধেও অংশ নিতেন। ছোট ছোট জমিদারদের বড় রাজাকে কর পাঠাতে হতো—

''কেটোলে বান্ধিতে আজ্ঞা হইল রাজার।
বলে রাজা কোটালিয়া খাও বৃত্তি-ভূমি
দেশের বারতা বেটা নাহী পাই আমি।
এক রাজ্যে দুই রাজা বড় অবিচার
ধুতি খায়্যা বুল বেটা কোটাল আমার।''[৪]

কালকেতু বন কেটে বসত তৈরি করে গুজরাট নগরীর পত্তন করেছিল। বসত করার জন্য তার প্রয়োজন ছিল মানুষের। তার রাজ্যে এল নানা শ্রম-সম্প্রদায়ের মানুষ—

‘‘তেলি বৈসে কত জনা কেহ চাষী কেহ ঘন্য
কিনিঞা বেচয়ে কেহ তেল
কামার পাতিয়া শাল কুঠারি কোদাল ফাল
গড়ে টাঙ্গি অঙ্গরখি সেল।
লইআ গুবাক পান বৈসে তাম্বুলিগণ
মহাবিরে নিত্য দেই বিড়া
গুবাক সহিত পানে বিড়া বান্ধে সাবধানে
কখন না পায় রাজপীড়া।
কুম্ভকার গুজরাটে হাঁড়ি কুড়ি গড়ে পিটে
মৃদঙ্গ দগড় কাড়া পড়া
শত শত এক জায় গুজরাটে তন্ত্রবায়
ভুনি খুনি ধুতি বোনে গড়া।
মালী বৈসে গুজরাটে মালঞ্চে সদাই খাটে
মালা মউড় গড়ে ফুলঘর
ফুলের পুটলি বান্ধে সবজি দণ্ড করিকান্ধ
ফিরে তারা নগরে নগর।’’[৫]

কালকেতু অন্যান্যদের মত তেমন নিষ্ঠুর প্রজাপীড়ক ছিলেন না। তার ভূমিকা প্রজাদের কল্যাণে নিয়োজিত ছিল। বুলান মণ্ডলের সঙ্গে কালকেতুর কথোপকথনের সময় তার একটি সুন্দর ছবি ফুটে ওঠে—

‘‘শুন ভাই বুলন মণ্ডল
আইস আমার পুর সন্তাপ করিব দূর
কানে দিব হেমকুণ্ডল।
আমার নগরে বৈস জত ভূমি চাষ চষ
সাত সন বই দিয় কর।’’[৬]

জমি নেওয়ার জন্য প্রজাকে সেলামী দিতে হোত। এছাড়াও পঞ্চায়েত বা পাঁচ প্রধানকেও উৎপাদিত ফলের নজরানা দিতে হতো। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ফসল না হলে করের

জন্য উৎপীড়ন করলে প্রজারা অন্যের জমিদারিতে চলে যেত। মুসলমানদের বর্ণনা করতে গিয়ে যে সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন তা বর্তমানকালের জাতি-মুক্তিতত্ত্বের নির্দশন। আসলে মুকুন্দ মধ্যযুগের সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে নিজেকে স্থাপিত করতে পেরেছিলেন। মুকুন্দের কাব্যে হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থান সে যুগের প্রতিবেশীসুলভ ভ্রাতৃ-প্রতিম মনোভাবের পরিচয় দেয়—

''মোললা পড়াইয়া নিকা দান পায় সিকা সিকা
দোয়া করে কলিমা পড়িআ।
করে ধরি করা ছুরি মুরগী জবাই করি
দশ গণ্ডা দরে পায় কড়ি
বকরি জবাই জথা মোললাকে দেই মাথা
দরে পায়ে কড়ি ছয় বুড়ি
জত শিশু মুসলমান করিআ দলিজখান
মখদ্দম পড়ায়ে পড়ানা।''[৭]

সামন্ততান্ত্রিক যুগে রাজনীতি না থাকায় সাম্প্রদায়িক বিভাজন সম্ভবত ছিল না। সামন্ত রাজারা নিজেদের ভোগবিলাস, নিজেদের আধিপত্য বা প্রতিপত্তিতেই নিবিষ্ট থাকতেন যে প্রজাবিদ্রোহ বা এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটার আগেই সম্ভবত নির্মূল করা হোত।

ধনপতির উপাখ্যানে আমরা আধুনিক অর্থনীতির চমকপ্রদ প্রকাশ লক্ষ করি। ধনপতিকে রাজার আদেশেই অন্যদেশে বাণিজ্যযাত্রা করতে হয়েছিল। বাণিজ্যের মধ্যদিয়ে আমদানী-রপ্তানী দুই চলত। তবে রাজার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল বণিকদের ওপর। এই বণিকদের মধ্যে সবাই ধর্মপরায়ণ ব্যবসায়ী ছিলেন না। মুরারি শীলের মত খল স্বভাবের বণিকও ছিল, মুকুন্দের বর্ণনাতে তা স্পষ্ট। সমকালে উচ্চশ্রেণির লোকেরা টোলে সংস্কৃত, জ্যোতিষ, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে পাঠ নিত।

মুরারি শীলের শঠতা, ভাঁড়ু দত্তের অভাবের জন্য ছলনা ও সংকীর্ণতা, পুরুষের বহুবিবাহ, প্রজাদের ওপর রাষ্ট্রের শোষণমূলক ব্যবস্থা, পুরুষ চরিত্রের সংকীর্ণতা, অবিশ্বাস, সন্দেহ মুকুন্দের রচনায় সাবলীলভাবে বিস্তার লাভ করেছে। যুগলক্ষণকে তাঁর কাব্যে অসামান্য মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি, প্রেম-প্রীতি-ধর্মচেতনা

প্রভৃতি মানবিক চেতনাগুলি মিশ্রভাবে তাঁর কাব্যে স্থান লাভ করেছে।

মুকুন্দের কাব্যের জীবনরসকে উপলব্ধি করতে গেলে হর-গৌরীর সংসারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে ক্ষেত্রগুপ্ত বলেছেন—"তিনি পরিবারতন্ত্রের কবি। বাঙালির গৃহজীবনের শ্লথগতি স্তিমিত ঘটনার চিত্রাঙ্কনেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। কাহিনির নানা শাখায়িত বিস্তার, পল্লবিত অলঙ্করণ এবং প্রথাবদ্ধতার মধ্য থেকে কবির সৃষ্টির এই কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্যে দৃষ্টিপাত করতে হবে। কবির বাস্তবদৃষ্টি আপন অভিজ্ঞতার জগৎ বাঙালি পরিবার-জীবনকেই বেছে নিয়েছে।"[৮]

গ্রন্থের প্রারম্ভ দেব- দেবীদের স্তুতি দিয়ে শুরু হলেও দেবখণ্ডের সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র হল শিব ও তার ঘরণী গৌরী। ঘটনার এই অংশে দৈবী মহিমার আভিজাত্য থেকে মুক্তি দিয়ে দেব-দেবীদের মানবায়ন ঘটিয়েছেন তিনি। মানুষের বিভিন্ন দোষগুণ যেমন—অহংকার, ক্রোধ, তুষ্টি আহ্লাদ এসবই দেবতাদের ওপর আরোপ করেছেন।

দক্ষকন্যা সতীর স্বামী শিব বাঘছাল-হাড়মালা পরিহিত এক বিভূতিভূষণ যোগী। দক্ষ শিবের মাহাত্ম্য বোঝেনি। কবির বর্ণনায় শিব হয়ে উঠেছেন এক ধনী পিতার সহায় সম্বলহীন জামাতা। নারদের পরামর্শে দক্ষ প্রজাপতি মহাদেবের সঙ্গে নিজ কন্যা সতীর বিবাহ দেন এবং নানান যৌতুক দিয়ে তাদের কৈলাসে পাঠান—

"ষোড়শ কন্যার মধ্যে মুখ্য সুতা সতী
ধর্মমোক্ষ- হেতু হৈলা আপনে প্রকৃতি।
নারদের উপদেশে দক্ষ প্রজাপতি
মহাদেবে বিবাহ দিলেন কন্যা সতী।
নানাধন জৌতুকে পুরিয়া অভিলাষ
বরকন্যা দক্ষমুনি পাঠাইলা কৈলাস।"[৯]

বিবাহে যৌতুক দেওয়ার প্রথাটির উল্লেখ করেছেন কবি। ভৃগুমুনি এক যজ্ঞের আয়োজন করেন সেখানে দেবসমাজের সকলে নিমন্ত্রিত ছিলেন। সমগ্র দেবতাদের সঙ্গে শিব এবং দক্ষ মুনিও উপস্থিত হন। দক্ষকে দেবতারা প্রণাম করে সম্মান জানালেও শিব কিন্তু দক্ষকে কোনো প্রণাম করলেন না। আর এঘটনায় দক্ষ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। এই হল বিবাদের সূচনা—

"শুন রে সভার লোক এ বড় দারুন শোক

এই শিব আমার জামাতা

আইলাঙ যজ্ঞের স্থান না করে আমার মান

মোরে নম্র না নোঙাঞে মাথা।''[১০]

এরপর দক্ষ শিব দরিদ্র বলে দক্ষ দীর্ঘ শোক প্রকাশ করেছেন—

''ভূষণ হাড়ের মালা শ্মশানে বিনোদশালা

হেন জন আমার জামাতা।

দক্ষ দানা প্রেত ভুত বসতি সভার ভুত

সহযোগ শয়ন ভোজন

জাতের নাহিক স্থিতি সে জন কন্যার পতি

দেবকুলে কেবল গঞ্জন।''[১১]

এখানে ক্রুদ্ধ দাম্ভিক পিতাকে আমরা দেখতে পাই। শিবকে অপমান করার জন্য দক্ষ এক যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেখানে অন্যান্য সমগ্র দেবতাদের নিমন্ত্রণ থাকলেও শিবকে কোন নিমন্ত্রণ দক্ষ পাঠাননি। দক্ষের যজ্ঞে আমন্ত্রিত না হয়েও কন্যা সতী যখন সেখানে যেতে চাইলেন তখন প্রচলিত সামাজিক বিধির কথা মনে রেখে শিব তাঁকে বাধা দিলেন। কারণ—

''শুনিয়া সতীর বাণী কহিলেন শূলপানি

শুন প্রিয়ে আমার বচন

বাপ-ঘরে জবে চল তবে না হইবে ভাল

ভবিষ্যৎ বহু বিড়ম্বন।''[১২]

কিন্তু সতী সে কথা শোনে না। তাঁর মন বড় আকুল। বিবাহের পর তাঁর 'বাপের ঘর'-এ যাওয়া হয়নি। যখন স্বর্গ-মর্ত-পাতালের সমস্ত ব্যক্তিত্ব সেখানে হাজির, তখন কন্যা কি করে না গিয়ে পারে। দেবী সতীর মধ্যে কবি মুকুন্দ একজন মানবিক কন্যার সমস্ত আকুলতাকে প্রকাশিত করেছেন—

''ত্রিভুবনে জত বৈসে চলিল বাপের বাসে

তনয়া কেমনে প্রাণ ধরে।

চরণে ধরিয়া সাধি কৃপা কর কৃপানিধি

জাব পঞ্চ দিবসের তরে

চিরদিন আছে আশ জাইব বাপার পাশ

নিবেদন নাঞি করি ডরে।

সুমঙ্গল-সূত্র করে আইলাঙ তোমার ঘরে

পূর্ণ হইল বৎসর সাত

দূর কর বিবাদ পুরহ আমার সাধ

মাত্রর রন্ধনে খাব ভাব।''[১৩]

সতী গেলেন পিতার গৃহে। কন্যাকে পেয়ে মায়ের মন পুলকিত। এসময়ের যে চিত্র কবি অঙ্কন করেছেন—

''পাইল বাপের গ্রাম শুনিঞা সতীর নাম

প্রসূতি ধাইল বেগবতী

কোলেতে করিয়া সতী প্রসূতি পুলকমতি

কইল দেবি মাত্ররে প্রণতি।

আনিয়া আপন ঘরে প্রসূতি দিলেন তাঁরে

পাদ্য অর্ঘ্য কনক আসন

জতেক বহিনীগণ সভে কইল আলিঙ্গন

ঘরের কুশল জিজ্ঞাসন।''[১৪]

বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকলে এরূপ পদ রচনা করা সম্ভব নয়। মঙ্গলকাব্যের দেবতারাও যেন বাস্তব পৃথিবীর মানুষ হয়ে উঠেছেন। একান্ত সাধারণ রক্ত মাংসের মানুষের মত বেদনা-আনন্দে, দুর্বল আবেগে একেবারে সাধারণ মানুষের মত আচরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ক্ষেত্র গুপ্ত 'কবি মুকুন্দরাম' গ্রন্থে ('Encyclopadia of Literature, Vol.') এ প্রসঙ্গে বলেছেন— ''মুকুন্দরাম অভিজ্ঞতার কবি। তাঁর বাস্তবচেতনার ভিত্তিতেও অভিজ্ঞতাই প্রথম কথা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রূপদান বাস্তববাদী শিল্পীর পক্ষে হয়তো সুবিধাজনক। যেসব ঘটনা এবং যে-জাতীয় মানুষের সংস্পর্শে তিনি প্রত্যক্ষ এসেছেন তাদের কথা বলায় কল্পনার ঋণ স্বীকার করতে হয় না। সত্যের প্রতি বিশ্বস্ততা অটুট থাকে।''[১৫]

দক্ষের কন্যার প্রতি ভালোবাসার সীমা নেই। কিন্তু জামাতার প্রতি তার অভিমান ও ক্ষোভ

রয়েছে। তাই কন্যাকে বলেছেন—

‘‘তোমার কর্মের গতি স্বামী হইল বামপথি
তারে যজ্ঞে আনি কী কারণ।
শিবের পরিধান বাঘছাল গলাএ হাড়ের মালা
বিভূতি ভূষণ জার অঙ্গে
শ্মশানে জাহার স্থান কেবা করে তার মান
প্রেত ভুত চলে তার সঙ্গে।’’[১৬]

দক্ষের মুখে শিবনিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করলেন। ক্রোধে শিব দক্ষ যজ্ঞ বিনাশ করেন।

সতী পুনরায় হিমালয় পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর নাম হয় উমা। কাব্যের এ অংশটি কবি পারিবারিক চিত্রপটে অঙ্কন করেছেন। কঠোর তপস্যায় শিবকে সন্তুষ্ট করে পার্বতী তাঁকে এ-জন্মেও পতি হিসেবে পেলেন। শিব-গৌরীর বিবাহের বর্ণনা হাস্যরসের উদ্রেগ করেছে। সেই সঙ্গে বিবাহ বাসরে ‘নারীগণের পতিনিন্দা’র অংশটির মধ্য দিয়ে কবির বাস্তব অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধি করা যায়। শিবকে দেখে মেয়েদের নিজ স্বামীদের প্রতি মনোভাব ঠিক এরকম—

‘‘সভে বলে গৌরী বর পাইয়াছে ভাল
মদনমোহন রূপে ঘর করিআছে আল।
এক আইয় বলে হেদে গোদা মোরপতি
কোয়া জ্বরের ঔষধ সদাই পাব কতি।
ভাদ্র মাসের পাঁকই বড় দুরবার
গোদে তৈল দিতে কত তুলিব নেকার।
এক আইয় বলে স্বামী বর্জিত দর্শন
শাক সুক্তা ঘন্ট বিনে না করে ভোজন।
জে দিবস আমি দ্রড় ব্যঞ্জন রাঁধি
মারএ পিড়ার বাড়ি কোনে বস্যা কান্দি।
এক আইয় বলে আমার কর্ম মন্দ
অভাগিয়া স্বামী মোর দুই চক্ষু অন্ধ।

কোন দেশে নাঞিক দুখিনী মোর পারা
কাছে কাছে থাকিতে সদাই হয় হারা।
আর যুবতি বলে মোর স্বামী বড় কালা
আনের সংসার ভাল মোর হইল জ্বালা।
ঠারে ঠোরে কহি কথা দিনে পতির সনে
রাত্রে নিদ্রা জাই জেন পশুর শয়নে।
আর যুবতী বলে মোর মুণ্ডে পড়ু বাজ
আর রমণী বলে সই কহিতে বাসি লাজ।
নগরে বার্যাতে নারী সত্যে মরি লাজে
খাট ভাতার ঢেঙ্গা মাণ্ড দেখ্যা লোক গঞ্জে।
এমন সময় আইল বুড়ি একজন
দেখিয়া বরের রূপ জাগিল মদন।
পোত্রর হইয়াছে পো তার হইয়াছে ঝি
পোড়গ তেলে চুল পাকীআছে বয়েস বটে কি।
নাতিনের বেটীর বিভা মোর মনহারি
হের আইস সাঁগাতিয়া বর তোরে কোলে করি।
এমন সময় আইল বিধবা জন সাত
দেখিয়া বরের রূপ নাকে দিল হাত।
রূপে গুণে নাতিনী আমার ঘরে আছে
হেন বরে বিভা দিআ রাখি নিজ কাছে।
দেখিআ বরের রূপ জতেক যুবতী
মনে মনে নিন্দা করে আপনার পতি।’’[১৭]

সমকালীন সমাজে কন্যা দায়গ্রস্ত কুলীন পিতারা কুলমর্যাদা রক্ষার খাতিরে হাতের কাছে যাকে পেতেন তার হাতেই কন্যা সমর্পন করে সমাজে পতিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতেন। সেখানে হয়তো আট বৎসরের কন্যার সঙ্গে সত্তর বৎসরের বর জুটলেও অনেক ভাগ্য বলে সমাজ কর্তৃক আদৃত হত। আর শারীরিক ভাবে বিকৃতিদোষ তো আছেই। এভাবেই

ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল মত প্রকাশের অধিকার। যেখানে বিবাহ অর্থে পুরুষের আজ্ঞা পালন আর পুত্র উৎপাদনই ছিল প্রধান। সুতরাং কানা, খোঁড়া, কুঁজগ্রস্ত যেমনই হোক তাকেই গ্রহণ করতে হবে নারীকে। সামাজিক বিধির এই বাধনেই বাধা ছিল নারীরা। মধ্যযুগব্যাপী কৌলীন্য প্রথার চাপে ক্লিষ্ট অসহায় মুখগুলি কবির অভিজ্ঞতার কলমে কাব্যে স্থান পেয়েছে। 'গৌরীর বর' দেখে নারীদের অবদমিত আকাঙক্ষা ভিতরে ভিতরে স্বাভাবিক ভাবেই তাদের অস্থির করে তুলেছে। বাস্তবে যা কোনোদিন চরিতার্থ হবার নয়। সেই অপূর্ণ বাসনাকে আপাত রসিকতায় চাপা দিতে চায় তারা। স্বামীর দাঁত নেই বলে 'দড় ব্যঞ্জন' খাবার অধিকার নেই যুবতীর। শখ করে রাঁধলে পিঠে পিঁড়ের বাড়ি জোটে। বৈধব্যের জীবনে রং লাগে। নাতিপুতি ভরা সংসার জীবন অতিবাহিত হলেও বয়স জনিত কারণে যুবক দেখলে মনে কামনার উদয় হয়, গোপন অভীপ্সাও উঁকি মারে। তাই নিজের জীবনে যা অধরা, পরের প্রজন্মের কাছে তাকে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। নারী মনের এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলিকে জীবনরসিক কবি গভীর মনোযোগে অনুভব করেছিলেন বলেই তাঁর 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যখানি এমন বাস্তবজীবন গাথা হয়ে উঠছে।

বিয়ের পর মহাদেব ঘরজামাই রূপে শ্বশুর গৃহেই থেকে গেলেন। তৎকালীন সমাজের ঘরজামাই রাখার প্রথা এবং তৎজনিত সমস্যাও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি কাব্যের উক্ত অংশে। ক্রমে সংসার বেড়েছে শিব-পার্বতীর, কার্তিক-গণেশ দুই পুত্রের জননী হয়েছেন উমা। শিব ও মহানন্দে শ্বশুরের অন্ন ধ্বংস করে যাচ্ছেন। পরিবার প্রতিপালনের জন্য তার বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নাই। শুধু আপন পরিবারই নয়, সঙ্গে ভূত-প্রেত এবং অনুচরেরাও রয়েছে তাঁর সঙ্গে। এসব দিনের পর দিন সহ্য করে যাওয়া মেনকার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠায় তিনি বলেন—

''হাথে পাটী করি গৌরী ডাকেন দশ দশ
হেন কালে মেনকার বাড়িল বিরস।
তোমায় ঝি হইতে মোর মজিল গার‍্যাল
ঘরে জাওঙাঞি রাখিআ পুষিব কতকাল।
প্রভাতে ভাতেরে কান্দে কার্তিক গনাই
চারি কড়ার সম্ভাবনা তোমার ঘরে নাঞি।

মিথ্যা কাজে ফিরে পতি নাঞি চাষবাস
ভাত কাপড় কত না জোগাব বার মাস।
দুগ্ধ উত্তলিআ পড়ে নাঞি দেহ পানি
সখি সঙ্গে খেল পাশা দিবস রজনী।
দরিদ্র তোমার পতি পরে বাঘছাল
সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মাল।
প্রেত ভূত পিশাচ মেলিআ তার সঙ্গ
অনুদিন কত না কিনিঞা দিব ভাঙ্গ।
লোক-লাজে স্বামী মোর কিছু নাঞি কয়
জামাতার পাকে হইল ঘরে সাপের ভয়।''[১৮]

অভিমানি গৌরী মায়ের কথা শুনে কেঁদে ফেলেন। সামান্য দু'মুঠো ভাতের জন্য এত খোঁটা। গৌরীও মাকে কথা শোনাতে ছাড়ে না—

''রাঁধ্য বাড়িয়া মাতা কত দেহ খোটা
আজি হইতে তোমার দ্বারে দিল কাঁটা।''[১৯]

পরবর্তী পর্বে তদানীন্তন দরিদ্র বাঙ্গালী পরিবারের দৈনন্দিন ঘরকন্যার দৃশ্যটি কবি নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—

''দারুণ কর্মের দোষে হইলাঙ দুঃখিনী
ভিক্ষার ভাতে দারুণ বিধি করিল গৃহিনী।''[২০]

সমাজে সপত্নী সমস্যা মহামারীর মতো ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্যাধ-কাহিনি থেকে শুরু করে বণিক খণ্ডের কাহিনিতে বারবার সপত্নী সমস্যার কথা উঠে এসেছে। কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনিতে ফুল্লরা দেবীকে প্রথম দেখে সপত্নী শঙ্কায় ভীত হয়েছে। তার সংসারের প্রতি ভীতি প্রদর্শনের জন্য দেবীকে দুঃখের বারোমাস্যা শুনিয়েছে। ধনপতি উপাখ্যানেও 'লহনা-খুল্লনা' বিবাদের প্রধান কারণই সপত্নী সমস্যা। এমনকি কাব্যের অন্তিমে শ্রীমন্তের পুনর্বিবাহের কারণে পত্নী সুশীলার অভিমানের প্রধান কারণও সপত্নী সমস্যাকে কেন্দ্র করেই—

কান্দে সিলা রাজার নন্দিনী

আকুল কুন্তলভার না জানে পড়িল হার
স্বামীরে গঞ্জিআ বলে বাণী।
জন্ম হইল সুখস্থলে ছিনু মা-বাপের কোলে
নাহী জানি দুখের বারতা
প্রথম বয়সে দুখ ধরণ না জায় বুক
কোন দোষে দিলে মোরে সতা।''[২১]

পুরুষের একাধিক বিবাহ বহু প্রাচীনকালের রীতি। একারণেই সুখের সংসারে বার বার আগুন ধরেছে। 'পুন্যিপুকুর' ব্রত করে মেয়েরা একসময় বলত, 'হাতা হাতা হাতা/খা সতীনের মাথা।' এখানে এক নারী অন্য নারীর মৃত্যু কামনা করছে। আর লহনা-খুল্লনার বিবাদ প্রতীকমাত্র।

সংসারে অভাব অনটন-এ হর-গৌরীর দ্বন্দ্ব, গৌরীর অভিমান, সপত্নী সমস্যা ইত্যাদি সমকালীন বাস্তবের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। সমকালীন বাঙালি মেয়েদের জীবনে 'দুঃখ যৌতুক' যে ধ্রুব সত্য তা মুকুন্দ উপলব্ধি করেছিলেন এবং কাব্য মধ্যে সেসব বিষয়কে উপস্থাপিত করেছেন। তবে তিনি শুধুমাত্র কঠোর বাস্তবরসকে সার্থকভাবে পরিবেশিত করেছেন এমন নয়, জীবনের আনন্দময় দিকগুলিকেও কাব্যের বিষয় করে গড়ে তুলেছেন। নরখণ্ডে নিদয়ার সাধ ভক্ষণ, ষষ্ঠী পুজো, কালকেতু-ফুল্লরার বিবাহের আচার, নানান যৌতুক দেওয়া ইত্যাদি সমাজের আনন্দোল্লাসের দিকগুলিকেও উপস্থাপিত করেছেন।

কবিকঙ্কণ নিজের আত্মোপলব্ধিকেই কাব্যে স্থান দিয়েছেন। তাঁর কৌতুকরস কেবল কথায় সীমাবদ্ধ নয়, তা বঙ্কিম কটাক্ষ, জীবনের নানামুখী বিস্তার থেকে তীর্যক রেখায় ঠিকরে পড়েছে। কালকেতুর ধনপ্রাপ্তির প্রসঙ্গটি হাস্যরসের অবতারণা করে। দেবী চণ্ডী কালকেতুর দুঃখ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে মানিক অঙ্গুরী দিতে চাইলে ফুল্লরা সেটি নিতে নিষেধ করে। ফুল্লার অভিলাষ বুঝে দেবী কালকেতুকে সাত ঘড়া ধন দেন। কালকেতুর ছয় ঘড়া ধন নিয়ে যেতে কোনো অসুবিধে হয় না। কিন্তু সপ্তম ঘড়া ধন বহনের বেলায় কালকেতু দেবীকে অনুরোধ করে—

''যদি মোরে ধন দিলে সেবকবৎসল
একঘড়া ধন গো আপনি কাখে কর।''[২২]

অগত্যা ধনঘড়া কাঁখে নিয়ে কালকেতুর পিছনে পিছনে চলেন। কিন্তু দেবীর কাছে ধন-পেয়েও কালকেতু দেবীকে অবিশ্বাস করেছে—

''আগে আগে মহাবীর করিল গমন
পশ্চাত পার্বতী জান লইআ তার ধন।
মনে মনে মহাবীর করে জুগতি
ধন-ঘড়া লঈআ পাছে পালায় পার্বতী।''[২৩]

এ অবিশ্বাস সমাজ বঞ্চনা থেকে সৃষ্ঠ হয়েছে। অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক নির্যাতন ছিল যার প্রধান কারণ। মুরারি শীলের প্রসঙ্গে সে ধারণা আরো স্পষ্ট হয়েছে। কালকেতু মুরারি শীলের কাছে দেবী প্রদত্ত 'আংটি' বিক্রি করতে এলে মুরারি ভাবে কালকেতু মাংসের টাকা নিতে এসেছে। তাই সে বাড়ির মধ্যেই আত্মগোপন করে। মুরারি পত্নীও টাকা দেওয়ার বদলে তাকে কাঠ আনতে নির্দেশ দেয়। শেষে টাকার আভাস পেয়ে মুরারি কালকেতুর কাছে আসে। বহুমূল্য আংটিকে পিতলের সমান দাম দিয়ে আত্মসাৎ করতে চায়। অঙ্গুরী বিক্রয়ের প্রসঙ্গটিতে বেনের নীচতা, মিথ্যাভাষণ, অভিনয় পটুতা, পাঠকের মনে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। সেইসঙ্গে কাব্যমধ্যে এসেছে ভাঁড়ু দত্তের প্রসঙ্গ। ভাঁড়ু কাঁচকলা ভেট নিয়ে কালকেতুর সঙ্গে দেখা করতে গেছে। ভাঁড়ুর ছেঁড়া ধুতি কিন্তু কোচা লম্বা—

''ভেট লৈয়া কাঁচকলা পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা
আগে ভাঁড়ুদত্তের পয়ান
ফোঁটা পাটা মহাদম্ভ ছিঁড়া জোড়ে কোচা লম্ব
শ্রবণে কলম খরসান।
প্রণাম করিআ বীরে ভাঁড়ু নিবেদন করে
সম্বন্ধ পাতাইয়া খুড়া খুড়া
ছিঁড়া কম্বলে বসি মুখে মৃদু মৃদু হাসি
ঘন ঘন দেই বাহু-নাড়া।
খুড়া আইলাঙ প্রতিআসে বসিতে তোমার দেশে
আগেতে ডাকিবে ভাঁড়ু দত্তে
জতেক কায়েস্ত দেখ ভাঁড়ুর পশ্চাতে লিখ

কুলে শীলে বিঢ়াবে মহত্ত্বে।''[২৪]

ভাঁড়ুর অত্যাচারের কথা হাটুরিয়াগণ কালকেতুর কাছে অভিযোগ জানালে কালকেতু ভাঁড়ুকে গুজরাট থেকে বিতারিত করে। ভাঁড়ু কালকেতুকে বিপদে ফেলতে জ্যেষ্ঠ ভাই শিবাকে বিয়ের লোভ দেখিয়ে কলিঙ্গরাজের রাজসভায় নিয়ে যাওয়ায় জন্য রাজি করে। কলিঙ্গ রাজকে কুমন্ত্রণা দিয়ে কালকেতুকে বিপদে ফেলে। সমস্ত ঘটনায় হাস্যরসের উদ্রেগ ঘটলেও এ হাসি অনেক ক্ষেত্রে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। দুঃখ-অভিজ্ঞতার সঙ্গে হাসি মিলিয়ে জীবনরসে কাব্যকে ভরপুর করেছেন। কবির এই জীবনচিত্র কথায় সীমাবদ্ধ না থেকে তাঁর গভীর জীবনদর্শনের নানা বিস্তারের মধ্য থেকে তির্যক রেখায় ঝলকানি দিয়েছে। তাই হয়তো 'চণ্ডীর নিকট পশুগণের ক্রন্দন' অংশটিও আমাদেরকে কঠোর বাস্তবতার সম্মুক্ষিন করেছে—

''উইচারা খাই পশু নাম ভাল্লুক
নেউগি চউধরি নহি না করি তালুক।
সাত পুত্র মারিলেক বান্ধি জালপাশে
সবংশে মজিলাঙ মাতা তোমার আশ্বাসে।''[২৫]

সমকালীন সমাজ বাস্তবতা পশুগণের ক্রন্দনে ফুটে উঠেছে। ভালুকের বেনামে জবানবন্দী আসলে মুকুন্দের। দামিন্যায় সাত পুরুষ ধরে চাষবাস করে দিনপাত করেছেন কবি ও তাঁর পূর্ব পুরুষেরা। কোনো তালুকদার বা ডিহিদার তাঁরা ছিলেন না। তবুও মামুদ সরিপের অত্যাচারে সাত পুরুষের ভিটা মুকুন্দকে ছাড়তে হয়েছিল।

মুকুন্দের কবিপ্রতিভা অনেক বেশি কমনীয় ও ঘরোয়া। তিনি বহু সমালোচকের চোখে পরিবারতন্ত্রের কবি। তিনি বাঙালির গৃহ জীবনের অন্দরমহলের একজন বিশ্বস্ত চিত্রকর। তিনি গ্রাম জীবনকে একেবারে আদ্যোপান্ত উপলব্ধি করেছিলেন, আর সে কারণেই চরিত্রগুলি একেবারে কালজয়ি হয়ে উঠেছে। কথার পর কথা গেথে তিনি সাহিত্য শিল্পের এক বিশাল ইমারত নির্মাণ করেছেন। মানব জীবনের বাস্তব চালচিত্র থেকে যে রসের উপলব্ধি করা যায় সেই রসই জীবনরস। মধ্যযুগে গুটিকয়েক স্রষ্টা সাহিত্যে সেই রসের প্রয়োগ ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মুকুন্দ চক্রবর্তী। তাঁর এই সাফল্য আসলে রসসৃষ্টির সাফল্য। তবে এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এইরস কাব্য শাস্ত্রের নবরস নয়, এ রস চিরনতুন ও অতি পুরাতন জীবনরস। তাই মানবজীবনে তাঁর কাব্যের গুরুত্ব আজও অমলিন।

সমালোচক রামানন্দ :

অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিমলগ্নে বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের যে গুটিকয়েক কবির সন্ধান পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন রামানন্দ যতি। দ্বিজ কৃষ্ণকান্তের বিবরণ থেকে জানা যায় তিনি সংস্কৃতে প্রায় চব্বিশটি পুস্তক রচনা করেছিলেন এবং মূর্খের হাত থেকে সাহিত্যকে উদ্ধারের হেতুই তিনি 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' রচনায় আত্মনিয়োগ করেন—

''চব্বিশ পুস্তক করিলেন সংস্কৃত।
সে সকল গ্রন্থ জান্যো পরম অমৃত।।
মূর্খ তরাইতে পূণ করিলেন ভাষা।
না বুঝিয়া তাহে নিন্দা করে কত চাষা।।
লোকের উদ্ধার হেতু করিলেন লীলা।
সঙ্গীত সিদ্ধান্ত গ্রন্থে প্রমান লিখিলা।।
সাধুরা জানেন প্রভু কৃপা অবতার।
ভাষাতে মুক্তির পথ করেন প্রচার।।''[২৬]

আবার 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে'র সমগ্র অংশ জুড়ে পাঠক মনে একজনই কবি বিরাজমান। তিনি হলেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী। কবিকঙ্কণের কাব্য ঘটনা প্রধান, বর্ণনামুখ্য নয়। বর্ণনার বদলে তিনি সামাজিক-পারিবারিক বিবরণ দিতে অধিক উৎসাহ বোধ করেছেন। কবি রামানন্দের সমালোচনার সূত্রপাত সেখান থেকেই। রামানন্দ কবিকঙ্কণের প্রায় দুই শতাব্দী পরের কবি। তিনি কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি খুঁটিয়ে পড়েছিলেন এবং মুকুন্দের কাব্যের দোষ বাহুল্য দেখে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল একজন কবি শুধুমাত্র দর্শক বা শ্রোতার মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে সস্তা খ্যাতির মোহে পড়ে দেবী চণ্ডীকে নিয়ে কাব্যরচনা করে ধর্ম এবং সাহিত্যে নিন্দার কাজ করেছেন।

মুকুন্দের কাব্য রামানন্দ খুঁটিয়ে পড়েছিলেন। তাই জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক সেই সব পঙ্‌ক্তিগুলিকে তিনি তাঁর রচনায় ব্যবহারও করেছিলেন। মুকুন্দ প্রতিভাধর কবি বলেই হয়তো রামানন্দের ক্ষোভ আরো তীব্র ছিল। যে প্রতিভা দিয়ে তিনি উৎকৃষ্ট রুচিশীল কাব্য লিখে জনকল্যাণ করতে পারতেন, তা না করে তিনি কাব্যকে ইতর সাধারণের রসনার বস্তু করে গড়ে তোলেন। তবে সমগ্র 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে'র সমালোচনা রামানন্দ

করেননি। বরং যে বিষয়গুলি কুরুচীশীল মনে হয়েছে তিনি শুধুমাত্র সেগুলিকেই তীরস্কার করেছেন।

রামানন্দ মূলত কবিকঙ্কণের কাব্যের দোষগুলি পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরার জন্য 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য'টি রচনা করেছিলেন। রামানন্দের প্রতিভা মুকুন্দের চেয়ে অনেক উচ্চ শ্রেণির, তাঁর রচনা অনেক জোরালো, কাহিনি অনেক গোছানো। তবে কাব্যে যে রসের অভাববোধ হয়েছে তা নয়। কাহিনির প্রয়োজনে উপযুক্ত রসের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাঁর কৌতুক সূক্ষ্মতর রামানন্দের কাব্যে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে কৌতুকরসের সমান মেলবন্ধন ঘটেছে। আর রামানন্দ মুকুন্দের কাব্যে এই মেলবন্ধনেরই অভাববোধ করেছিলেন। রামানন্দের কাব্যারম্ভে দেবদেবীদের বন্দনায় রামপ্রসাদী আকুলতা লক্ষ করা যায়। কাব্যের আরম্ভে বন্দনাংশেই রামানন্দ মুকুন্দের 'ইন্দ্রপুরে কাঁটাবন' নির্মাণের প্রসঙ্গটিকে এবং কলিঙ্গরাজ্যে 'গুজরাট নগর' নির্মাণ করাকে ভৌগোলিক বাস্তবতার দিক থেকে পরিহাস করেছেন—

''মুকুন্দের বিরচন ইন্দ্রপুরে কান্টাবন
ইন্দ্র সুত তাহে তোলে ফুল।
সর্পভূষা শোভে আঁকে পুষ্পের কন্টকে তাঁকে
দংশিয়া করিল বেয়াকুল।।
আরো শুন অদভুত জন্মিবে ব্যাধের সুত
সেখানে গেলেন ভগবতী।
কলিতে কলিঙ্গবনে কালকেতু সিংহাসনে
মল্লযুদ্ধ করিলেক কতি।
কলিঙ্গেতে গুজরাট তাহে বাঙ্গালীর হাট
বসিল ছাপান্ন গাঞি বাড়ী।।
না জানে কলিঙ্গরাযা বন কাটাইয়া তায়
কালকেতু করিলেন বাড়ী।।
ঘরখানা সয়াকোশ ইতে অনুভব দোষ
কালী গেলা বন্দ্যানের ঘরে।
কোটালের সনে রণ করেন অনেকক্ষণ

এইরূপে অপমান করে।।

অপমান করে আর কত।

দেবীর বক্ষের পরে বীরগণ চিত্র করে

কাঞ্চলীতে পশু পক্ষী যত।।''[২৭]

কাব্যের অভ্যন্তরে দেবীর অর্থাভাবের কথা বলেছেন মুকুন্দ। রামানন্দ সেকারণে মুকুন্দকে গাবর বলে গালিগালাজ করেছেন—

''কালী দহে পুরে কালী মাকে এত দেয় গালী

হিন্দু নয় মুকুন্দ গাবর।''[২৮]

দোষে ভরা মুকুন্দের কাব্য। রামানন্দের মতে দেবী যদি সত্যিই মুকুন্দকে দেখা দিতেন তবে মুকুন্দ তা কাব্যে লিখতে পারতেন না—

''চণ্ডী যদি দেন দেখা তবে কি তা জায় লেখা

পাঁচালীর অমনি রচন।

বুদ্ধি নাই জার ঘটে তারা বলে সত্য বটে

পথে চণ্ডী দিলা দরশন।।''[২৯]

এবং রামানন্দ জানান মুকুন্দের কাব্যের এই দোষগুলিকে তুলে ধরে তিনি লোকেদের চৈতন্যোদয় ঘটাবেন—

''এত দোষ উদ্ধারিতে লোকের চৈতন্য দিতে

চণ্ডী রচে রামানন্দ যতি।

অনেকের অনুরোধ কেহ না করিহ ক্রোধ

অনেক শিষ্টের অনুমতি।।''[৩০]

কালকেতু উপাখ্যানের শুরুতে তিনি মুকুন্দের কাব্যে আদি রসের ব্যবহারের সমালোচনা করেছেন। তিনি এই রসে ব্যবহৃত কাব্যকে কুকাব্যও বলেছেন—

''শৃঙ্গীর করুণ হাস্য অদ্ভুত বীর।

ভয়ানক রৌদ্র শান্তি বীভৎস গভীর।।

জ্ঞান রস ভক্তি রস এই একাদশ।

রৌদ্র বীর করুণ অদ্ভুত শ্রেষ্ঠ রস।।
ভক্তি জ্ঞান করুণা সকল রসে শ্রেষ্ঠ।
বৃহন্নারদীর মত্ বুঝ সব জ্যেষ্ঠ।।
আদি রস প্রকাশে মূঢ়ের মন মজে।
তেঞি কবি সকলেই সেই রসে ভজে।।
শিহ্লনো কহেন তাহে জগত মোহিত।
কুকাব্যেতে মত্ত কর্যা দেয় আরোচিত্।।''[৩১]

মা মেনকার ভর্ৎসনায় অভিমান করে গৌরী পিতৃগৃহ ত্যাগ করেছে। এরপর হর-গৌরীর নিজের সংসারের কলহকে মুকুন্দ বেশ রসিয়ে বর্ণনা করেছেন। আর এখানেই রামানন্দের আপত্তি। সমালোচনার সুরে তিনি বলেছেন—

''শিব নিন্দা শুন্যা সতী ত্যজ্যাছেন কায়।
গৌরী নিন্দিলেন শিব বল্যা কেহ গায়।।
কন্দল করিয়া গৌরী গেলা মহীপরে।
অন্নবিনা হৈয়া ক্ষীণা এ কথা কি ধরে।।
যতি বলে দুষ্টকথা আমি না লিখিব।
না বুঝিলে তাহারে কিরূপে বুঝাইব।।''[৩২]

পিতার মুখে শিবনিন্দা শুনে যিনি দেহত্যাগ করেছিলেন, সেই শিব ঘরণীর মুখে শিবনিন্দা রামানন্দের কাছে কল্পনাতীত।

আবার ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে ব্যাধে পরিণত করার জন্য মুকুন্দ যে দীর্ঘ কাহিনির আশ্রয় নিয়েছেন, রামানন্দ যতি তাতে ঘোর আপত্তি করেছেন। ইন্দ্রপুরীতে কখনোই কাঁটাবন থাকতে পারে না। আবার শিব সর্পের আভরণে ভূষিত, তিনি নীলকণ্ঠ হয়ে এক সামান্য পিঁপড়ার কাঁমড়ে ব্যাকুল, মুকুন্দের কাব্যের এসব ঘটনা রামানন্দের কাছে অযৌক্তিক মনে হয়েছে।

কালকেতুর বাল্যক্রীড়া, বিবাহ, লোকাচার এমনকি মুকুন্দের কাব্যে ধর্মকেতু সস্ত্রীক কাশীতে গমন ও সংসার থেকে অবসর গ্রহণ, কালকেতুর মাসে মাসে পিতা-মাতাকে মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা এসব ঘটনাই রামানন্দের অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। তিনি নিজের কাব্যে

এই কাহিনিগুলি বর্ণনা থেকে বিরত থেকেছেন—

''এইরূপে কালু কাটালেন কতকাল।
যতি বলে কুরসে কঙ্কণ কবি ভাল।।''[৩৩]

কালকেতুর ঘরে দেবীর রূপের প্রকাশে মুকুন্দ ও রামানন্দের বর্ণনায় বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। মুকুন্দের কাব্যে বিশ্বকর্মা দেবীর বক্ষোবসনে চিত্র অঙ্কন করেছেন। রামানন্দের বিচারে এ ধৃষ্টতা ক্ষমার অযোগ্য—

''অপমান করে কত আর।
দেবীর বক্ষের পরে বীরগণ চিত্র করে
কাঞ্চলীতে পশু পক্ষী যত।।''[৩৪]

রামানন্দ কবিকঙ্কণের ছন্দ জ্ঞান নিয়ে বারবার সমালোচনা করেছেন—

১. ''যদি কহে পরিহার ছন্দ জ্ঞান থাকে যা
থাকে মিত্র অক্ষরের জ্ঞান
সেই কর্য্যো বিবেচনা লইয়া পণ্ডিত জনা
মূর্খ হাতে হৈয় সাবধান।।''[৩৫]

২. ''কহে রামানন্দ মুকুন্দের ছন্দ
ধর্য্যা না দেখাইল্যে নয়।
প্রত্যেকে দূষিতে কিবা ভাব চিতে
তাহাতেও করি ভয়।''[৩৬]

মুকুন্দের কাব্যে দেবী কালকেতুকে একটি 'অঙ্গুরী' ও 'সাত ঘড়া ধন' দেন। এই আংটি নিয়ে রামানন্দ সমালোচনা করেছেন—

''অঙ্গুরী পায়্যাছে কালু বল্যা কেহ গায়।
অঙ্গুরী বেচিয়া সাত কোটি ধন পায়।।
তাহাতে যতেক দোষ বুঝিবা সকলে।
টাকা ভাঙ্গাইতে কালু নগরেতে চলে।।''[৩৭]

কবিকঙ্কণের কাব্য অলৌকিকতায় পূর্ণ। কথায় কথায় স্বপ্ন দর্শন। যেমন—'মুকুন্দকে দেবীর স্বপ্নাদেশ', আসা-যাওয়া ইত্যাদি কাহিনিতে পূর্ণ। রামানন্দ এই অলৌকিকতার প্রয়োগকে

ভালো চোখে দেখেননি। তিনি এসব থেকে কিছুটা বিরত থেকেছেন।

কাহিনিতে ভাঁড়ু দত্তের অংশটির সমালোচনা করেছেন রামানন্দ। মুকুন্দের কাব্যে ভাঁড়ু দত্ত আর বুলান মণ্ডলের নেতৃত্বে বানে ভাসা প্রজারা দলে দলে কালকেতুর নগরে গিয়ে বসতি করতে আরম্ভ করল। ভাঁড়ু খুড়ো বলে কালকেতুর সঙ্গে ভাব জমিয়ে নেয় আর অন্যদিকে হাটে গিয়ে বিনা পয়সায় জিনিস নিয়ে প্রজাদের অত্যাচার করে। প্রজারা অভিযোগ করলে কালকেতু ভাঁড়ুকে শাসন করে। ভাঁড়ু রেগে গিয়ে কলিঙ্গরাজের সভায় কালকেতুর নামে নানান মিথ্যা কথা বলে কলিঙ্গরাজকে ক্ষেপিয়ে তোলে। রাজা রেগে কোটালকে বন্দী করলেন। পাত্রমিত্রের অনুরোধে ছাড়া পেয়ে কাঁচুমাচু হয়ে কোটাল গুজরাট দেখতে এল এবং রাজাকে গিয়ে বর্ণনা দিল—এই একই ঘটনার বর্ণনা বারবার থাকায় রামানন্দ তাঁর রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কাহিনির পরিবর্তন করে বিষয়টির সমালোচনা করেছেন—

''বুঝ্যা দেখ মুকুন্দের মতে দোষ যত।
প্রত্যেকে লিখিয়া আমি বুঝাইব কত।।
যে যে ঠাঞি দেখিলাম তার বিপরীত।
যতি বলে বিবেচনা করিবা পণ্ডিত।।''[৩৮]

মুকুন্দ গ্রাম্যতা ও ঘরের কোন্দলকে কাব্যমধ্যে নানা স্থানে স্থান দিয়েছেন। দুর্বলা দাসীর চক্রান্ত, দুই সতীনের কোন্দল ইত্যাদি ঘটনার নিন্দা করেছেন রামানন্দ—

''মনুষ্যের ব্যবহার লিখিলেই পাপ ভার
গ্রাম্য গীত বল্যা তাকে কয়।
মুনি বাক্য যে যে ঠাঞি তা লিখিলে পাপ নাঞি
গ্রাম্য গীত শুন্যা পাপ হয়।।
মুকুন্দ মূর্খের বিরচন।
হরিদ্রাতে রাত্র কয় ইহাও পণ্ডিতে লয়
কবি বল্যা তাকে কেহ কন।।''[৩৯]

কিংবা,

''ছন্দ দোষ তার যত তাহা দেখাইব কত
মিত্র অক্ষরের আছে লেশ।

গ্রাম্য কথা রাশি রাশি তাহে তরলেরা ভাসি

মোহিত হৈয়াছে সর্বদেশ।।''[৪০]

রামানন্দ এভাবেই মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের সমালোচনা করেছে। তিনি মুকুন্দকে—মূর্খ, পামর, গাবর ইত্যাদি বলতোও বাকি রাখেননি। মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে'র সমালোচনা করাই রামানন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল' রচনার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়ায় কাব্যে কিঞ্চিৎ রসবোধের অভাব লক্ষ করা যায়।

তাছাড়াও রামানন্দ ছিলেন একনিষ্ঠ সাধক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী এবং নানান শাস্ত্রে জ্ঞানী পণ্ডিত মানুষ। কাব্যে তিনি সে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অবশ্য সে জ্ঞান সাধারণের বোধগম্য হয়নি বলেই হয়তো তাঁর কাব্যের আশানুরূপ শ্রোতা তিনি পাননি। এজন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন—

''বর্ণাতেই চাই শ্রোতা নাহি পাই

তেঞি তুচ্ছ কর্যা লেখি

রামানন্দ কয় পুঁথি করা নয়

লোকের পরীক্ষা দেখি।''[৪১]

অবশ্য এ দুঃখ প্রকাশ গায়েনেরও হতে পারে।

তথ্যসূত্র :

১. গুপ্ত, ক্ষেত্র : কবি মুকুন্দরাম, গ্রন্থনিলয়, ৫৯/১বি, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯, পৃ. ১৫।

২. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি-১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৩।

৩. তদেব, : পৃ. ৭৯।

৪. তদেব, : পৃ. ৮৬।

৫. তদেব, : পৃ. ৮১-৮২।

৬. তদেব, : পৃ. ৭৬।

৭. তদেব, : পৃ. ৭৮।

৮. গুপ্ত, ক্ষেত্র : কবি মুকুন্দরাম, গ্রন্থনিলয়, ৫৯/১বি, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯, পৃ. ১৫।

৯. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি-১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৯।

১০. তদেব, : পৃ. ৯।

১১. তদেব, : পৃ. ৯-১০।

১২. তদেব, : পৃ. ১১।

১৩. তদেব, : পৃ. ১০-১১।

১৪. তদেব, : পৃ. ১১।

১৫. গুপ্ত, ক্ষেত্র : কবি মুকুন্দরাম, গ্রন্থনিলয়, ৫৯/১বি, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯, পৃ. ১৭।

১৬. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি-১১০০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ১২।

১৭. তদেব, : পৃ. ২২।

১৮. তদেব, : পৃ. ২৫.

১৯. তদেব, : পৃ. ২৫।

২০. তদেব, : পৃ. ২৭।

২১. তদেব, : পৃ. ৩০৪।

২২.তদেব, : পৃ. ৬৫।

২৩. তদেব, : পৃ. ৬৫।

২৪. তদেব, : পৃ. ৭৭।

২৫. তদেব, : পৃ. ৪৯।

২৬. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ৪০৭।

২৭. তদেব, : পৃ. ১০০-১০১।

২৮. তদেব, : পৃ. ১০১।

২৯. তদেব, : পৃ. ১০২।

৩০. তদেব, : পৃ. ১০২।

৩১. তদেব, : পৃ. ১০২-১০৩।

৩২. তদেব, : পৃ. ১৪৯।

৩৩. তদেব, : পৃ. ১৫৫।

৩৪. তদেব, : পৃ. ১০১।

৩৫. তদেব, : পৃ. ১৬২।

৩৬. তদেব, : পৃ. ১৮০।

৩৭. তদেব, : পৃ. ১৭৬।

৩৮. তদেব, : পৃ. ১৯৪।

৩৯. তদেব, : পৃ. ২৩৭।

৪০. তদেব, : পৃ. ২৩৭।

৪১. তদেব, : পৃ. ৩০২।